জীবনে উপযোগী তা মানুষ আজ মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছে। এই পরিবেশ চেতনায় সমৃদ্ধ হবার ফলেই মানবিক শাস্ত্রগুলিও নতুন নতুন রূপ লাভ করে চলেছে। সনাতন অর্থনীতির পাশাপাশি জন্ম নিচ্ছে পরিবেশ অর্থনীতি। জীব প্রযুক্তি বিদ্যার চর্চায় নতুন মাত্রা যোগ করে দিচ্ছে পরিবেশ প্রযুক্তি বিদ্যা। এমনকি পরিবেশমুখী স্থাপত্যবিদ্যা, পরিবেশ সাংবাদিকতা প্রভৃতি শাস্ত্রও আজ গুরুত্বপূর্ণ অধিতব্য বিষয় হয়ে উঠেছে। হাল আমলে গড়ে ওঠা পরিবেশ নীতিদর্শনও এরকম একটি শাস্ত্র।

একক : ১.১ ■ সংজ্ঞা (পরিবেশ নীতিবিদ্যা) Environmental ethics

আক্ষরিক অর্থে যা আমাদের পরিবৃত করে রাখে তাই আমাদের পরিবেশ। গাছ-গাছালি, পাখ-পাখালি থেকে শুরু করে জল, বাতাস, আলো প্রভৃতির দ্বারা আমরা পরিবৃত। তাই এগুলি আমাদের পরিবেশেরই অংশ। মাত্রা বা পরিব্যাপত্রি দিক থেকে পরিবেশের কথা বলতে পারি আমরা। এই দিক দিয়ে পরিবেশর কথা বলতে পারি আমরা। এই দিক দিয়ে পরিবেশ দু'রকম — বৃহৎ ও সঙ্কীর্ণ। বৃহত্তর অর্থে পরিবেশ বলতে যা বোঝায় তাতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যা কিছু আছে সবই পরিবেশের অংশ। আবার সঙ্কীর্ণ অর্থে একটি পাঠকক্ষের বা একটি পুকুরের পরিবেশের কথা বলা যায়। পুকুরটি তীর ওই পরিবেশের সীমানা নির্দেশক। ওই সীমানা মধ্যস্থ পুকুরের জল, জলজ উদ্ভিদ, মাছ, ব্যাঙ প্রভৃতি নিয়ে পুকুরের পরিবেশ। এরকম একটি পরিবেশের ক্ষেত্রে তিনটি জিনিস লক্ষণীয় — সীমা, জৈব ও অজৈব উপাদান। পরিবেশের আর একটি শ্রেণীবিন্যাস আছে। আমরা প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম পরিবেশের (কথাও বলতে পারি। কৃত্রিম পরিবেশ মানব-সৃষ্ট। সমাজ, রাষ্ট্র, গ্রাম, শহর প্রভৃতি কৃত্রিম পরিবেশের) পর্যায়ভুক্ত। নদী, সাগর, পাহাড়, পর্বত প্রভৃতি প্রাকৃতিক পরিবেশ রচনা করে। মানুষ তার প্রয়োজনে কৃত্রিম পরিবেশের পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সাধন করে থাকে। প্রাকৃতিক পরিবেশ মানুষের খাদ্য, জল, আশ্রয় প্রভৃতি সরবরাহ করে। কিন্তু প্রকৃতি থেকে এসকল বস্তু সংগ্রহ করে মানুষ প্রকৃতির স্বরূপ বিনষ্ট করে। ফলে মানুষের জীবনে নানা রকম সংকটের সৃষ্টি হয়। প্রাকৃতিক সম্পদের যথেচ্ছ ব্যবহারে মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর অস্তিত্বই বিলুপ্ত হতে পারে। আজকালকার পরিবেশ বিজ্ঞানীরা এসকল কথা জনসমক্ষে তুলে ধরেছেন। দার্শনিকেরাও এ-ব্যাপারে পশ্চাৎপদ নন। তারাও মাথা ঘামিয়েছেন এ-ব্যাপারে। প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ কেমন হওয়া উচিত? মূলত এ প্রশ্নকে কেন্দ্র করেই হাল আমলের নীতিদার্শনিকদের জয়যাত্রা শুরু হয়েছে।

নীতিদার্শনিকেরা মনে করেন, প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সম্পর্ক। অরণ্য ধ্বংস হলে প্রকৃতির অক্সিজেন সরবরাহ বন্ধ হয়ে যাবে। যথেচ্ছভাবে কয়লা পোড়ালে পৃথিবীর

উষ্ণতা বৃদ্ধি পাবে। তাতে অকাল খরা বা অকাল প্লাবনের সৃষ্টি হবে। রেফ্রিজারেটর বানাতে ক্লোরোফ্লুরো কার্বন ব্যবহার করলে ওজোন গহ্বরের স্বাভাবিক শক্তি বিনষ্ট হবে। তাতে ত্বকের ক্যানসার অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠবে। প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে মানুষের এই যে আবহমান কাল থেকে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সম্পর্ক সেই সম্পর্ককে কেন্দ্র করে কয়েকটি ঔচিত্য-অনৌচিত্যের প্রশ্ন অনিবার্যতই উঠে পড়ে। পরিবেশ নীতিবিদ্যা বলতে যা বোঝায় তা মূলত এ-রকম ঔচিত্য-অনৌচিত্যের বিতর্ককেন্দ্রিক দর্শনের একটি শাখা। তাই বলা যায় — মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, সেই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার পটভূমি ও ফলাফল — এই সব বিষয়কে কেন্দ্র করে উদ্ভূত নীতিসূত্রগুলি যে শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয় সেই শাস্ত্র হলো পরিবেশ নীতিবিদ্যা। এই শাস্ত্র ব্যবহারিক নীতিবিদ্যার আওতাভুক্ত কেননা বর্তমান যুগে কিছু কিছু সংকট এমন তীব্রতার মাত্রায় পৌঁছেছে যেখানে ব্যবহারিক জীবনে এগুলির মোকাবিলা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

একক : ১.২ ■ পরিধি

মানুষের যাবতীয় ক্রিয়াকলাপ জীবন-প্রণালী, কর্মকৌশল, কর্মাদর্শ ও সূত্র পরিবেশ নীতিবিদ্যার আওতাভুক্ত। মানুষের এসকল কর্মধারার একটা পটভূমিও থাকে। আমরা এসব কাজের ফলাফলকেও উপেক্ষা করতে পারি না। পরিশেষে এসকল কাজের মূলে থাকে জগতের প্রতি মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি। এসবই পরিবেশ নীতিবিদ্যার আলোচ্য বিষয়।

পরিবেশ নীতিবিদ্যার স্থান ও কালগত ব্যাপ্তিও সুদূর প্রসারী। জল-জমি-বাতাস জুড়ে পৃথিবীর সমগ্র জীবকুল এর পরিধিতে পড়ে। এমনকি জীবকুল ছাড়িয়েও সৌর জগতের যে বিশাল ব্যাপ্তি তাও এর আলোচ্য বিষয়রূপে গণ্য। মানুষের কর্মের প্রভাব মহাকাশেও পড়ছে। বিগত কয়েক দশক থেকে কৃত্রিম উপগ্রহগুলির ধ্বংশাবশেষ যেভাবে মহাকাশে বৃদ্ধি পাচ্ছে তার নৈতিক বিচার পরিবেশ নীতিবিদ্যারই অঙ্গ।

অবশ্য এরকম বিষয় পরিবেশ নীতিবিদ্যার আলোচ্য কিনা তা নিয়ে নীতি দার্শনিকেরা একমত নন। তাঁদের অনেকেই মনে করেন যে, পরিবেশের নিষ্প্রাণ অংশ সম্বন্ধে ন্যায়-অন্যায়ের প্রশ্ন ওঠে না। তাই ওই সব বিষয় পরিবেশ নীতিবিদ্যার আওতায় আসে না। তবে সেই সকল পরিবেশ নীতিদার্শনিকদের সংখ্যাই বেশি যারা মনে করেন যে প্রাণ-অপ্রাণের সীমানা বিচার করে পরিবেশ নীতিবিদ্যার পরিধি নির্ণয় করা ঠিক নয়। তাদের মতে বিশাল বনাঞ্চল থেকে শুরু করে মহাশূন্য অবধি সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডই নৈতিক মূল্যে মূল্যবান এবং সেই হিসাবে পরিবেশ নীতিবিদ্যার আলোচ্য বিষয়।

স্থানগত ব্যাপ্তির মতো পরিবেশ নীতিবিদ্যার কালগত ব্যাপ্তিও লক্ষ্য করার মতো। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ — তিন কালের কোনোটিই নীতিবিদ্যার (পরিবেশ) বহির্ভূত নয়। অতীতের জীবনে পরিবেশ সংক্রান্ত নীতিবোধ কতটা প্রাধান্য লাভ করেছিল, আদিম অরণ্যচারী জীবনের পরিবেশ চেতনা আজকের দিনে কতটা প্রাসঙ্গিক — এসকল প্রসঙ্গ যেমন পরিবেশ নীতিবিদ্যার আলোচ্য বিষয়, তেমনি পরমাণু বিস্ফোপণের পরীক্ষা-নিরীক্ষা কী অর্থে জীবকুলের ভবিষ্যৎ বিনষ্ট করে তুলতে পারে তাও পরিবেশ নীতিবিদ্যার বিবেচনায় অপরিহার্য হয়ে ওঠে।

এই দুই রকম ব্যাপ্তি ছাড়া পরিবেশ নীতিবিদ্যার পরিধির সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে কয়েকটি বিতর্কিত প্রসঙ্গ। প্রসঙ্গগুলি নিম্নরূপ।

আমরা জানি সনাতন নীতিবিদ্যা বা আদর্শনিষ্ঠ নীতিবিদ্যার সাথে পরিবেশ নীতিবিদ্যার পার্থক্য আছে। পার্থক্যটা এই যে, সনাতন নীতিবিদ্যায় ন্যায়-অন্যায়ের বিচার মানুষ-কেন্দ্রিক। কিন্তু পরিবেশ নীতিবিদ্যা একমাত্র মানুষকেন্দ্রিক নয়। আদর্শনিষ্ঠ নীতিবিদ্যায় একমাত্র মানুষই স্বগত মূল্যবান। প্রকৃতির যে বিপুল রচনা-সম্ভার তার মূল্য কেবল মানুষের উদ্দেশ্য সাধনের উপায় হিসেবেই। পরিবেশ নীতিবিদ্যার বিচার ধারায় প্রকৃতির অনন্ত রচনা-সম্ভারও স্বগত মূল্যবান। আর বিতর্কের সূত্রপাত ঠিক এখানেই।

এরকম একটা বিতর্ক রয়েছে পরিবেশ নীতিবিদ্যার মূলে। বিতর্কটা একটা প্রশ্নকে কেন্দ্র করে। প্রশ্নটা এই — প্রকৃতিক পরিবেশের কোন্ কোন্ অংশকে স্বতঃমূল্যবান বলা যায়? এই প্রশ্নের সঙ্গে জড়িত আছে আর একটি প্রশ্ন — তা বলার ভিত্তিটাই বা কী? পরিবেশ নীতিদার্শনিকদের মধ্যে মতভেদ এই দুই প্রশ্নকে কেন্দ্র করেই। কোনো কোনো পরিবেশ নীতিদার্শনিক মনে করেন, প্রকৃতিতে স্বত-মূল্য আরোপের বেলায় একমাত্র মানদণ্ড হল বোধগম্যতা। এই মানদণ্ড অনুযায়ী প্রকৃতির যে সকল অংশ বোধসম্পন্ন সেই সকল অংশ স্বতঃমূল্যবান। বলা বাহুল্য, এরা বোধগম্যতা বলতে সুখ-দুঃখের অনুভবের ক্ষমতা বোঝেন। এই অর্থে মানুষ ছাড়া পশুরাও স্বতঃমল্যবান, কারণ তাদের যে ওই বোধ আছে তা সর্বজন স্বীকৃত। কিন্তু এই বোধগম্যতাকে আর এক শ্রেণীর দার্শনিক স্বতঃমূল্যবান জীবের মানদণ্ড বলে মানতে নারাজ। তাদের মতে কোনো কিছুর স্বত-মূল্য থাকার প্রমাণ তার বৃদ্ধি, বিস্তার, সম্প্রসারণ প্রভৃতি। এই অর্থে সমগ্র জীবকুল তথা মহাশূন্যও স্বতঃমূল্যবান এমনকি জল-জমি-বাতাস প্রভৃতিও এই অর্থে স্বতঃমূল্যবান। বলা বাহুল্য, দু'টি দলই নর-কেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধে। নরকেন্দ্রিকতা বর্জনের পক্ষে উভয় দলেরই সম্মতি আছে। তবে ব্রহ্মাণ্ডে কতটা অংশ স্বতঃমূল্যবান — তা নিয়ে এরা একমত নন।

যে সকল নীতিদার্শনিক পরিবেশকেন্দ্রিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করতে প্রয়াসী তারাও যে সকলে একমত পোষণ করেন তা নয়। যে প্রশ্নটিকে কেন্দ্র করে তারা বিতর্কে অংশ নিয়ে থাকেন তা হলো — সকল জীবকে সমান নৈতিক দৃষ্টিতে দেখা হবে কিনা? এই প্রশ্নটির অনেক বিভাগ-উপবিভাগ আছে। গাছপালা ও ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীবের নীতিধর্মগত গুরুত্ব সমান কিনা? একটি বন্য প্রাণী ও মানুষের প্রাণের মূল্য কি এক? এ সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে পরিবেশ নীতিদার্শনিকেরা পরিষ্কার দু'টি দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছেন। এদের একদল বলেন সমদৃষ্টির কথা। অন্যদল মাত্রা নির্ণয়ের পক্ষে। দ্বিতীয় দলের মতো বোধসম্পন্নতা, বুদ্ধিবৃত্তি প্রভৃতির বিচারে প্রাণের মূল্য স্থির করতে হবে। যে জীবের বোধসম্পন্নতা বেশি তার নৈতিক মূল্যও বেশি। যে জীবের তা কম তার নৈতিক মূল্যও কম। বিরোধী দল এ বিচারকে পক্ষপাত বিচার বলেই মনে করেন।

পরিবেশ নীতিদর্শনের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিতর্ক পশুকল্যাণকে কেন্দ্র করে। এখানেও দল দু'টি — একদলে রয়েছে পশুকল্যাণবাদীরা, অপরদলে রয়েছেন সংরক্ষণবাদীরা। সংরক্ষণবাদীরা মনে করেন যে সমগ্র বাস্তুব্যবস্থাই আমাদের বিবেচ্য। পশুকল্যাণবাদীদের সঙ্গে সবংরক্ষণবাদীদের বিতর্ক মূলত আঞ্চলিক সমস্যাকে কেন্দ্র করে। এরকম একটি সমস্যা গড়ে উঠেছে দলমার দামালদের কেন্দ্র করে। সেখানে হাতির সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় পরিবেশগত ভারসাম্য বিঘ্নিত হচ্ছে। বড়ো গাছ ছোটো গাছ, ঘাসবন প্রভৃতি এদের দ্বারা বিনষ্ট হচ্ছে। ফলে অন্যান্য জীবের খাদ্য ভাণ্ডারে টান পড়ছে। এমতাবস্থায় সংরক্ষণবাদীদের প্রস্তাব হচ্ছে — বাস্তুতন্ত্রের স্বার্থে কিছু কিছু বুনো হাতিকে মেরে ফেলা হোক। পশুকল্যাণবাদীরা এরকম প্রস্তাবের ঘোর বিরোধিতা করে থাকেন। কানাডায় সিল মাছকে কেন্দ্র করে, আফ্রিকায় বুনো হাতিদের কেন্দ্র করে, স্কটল্যান্ডে হরিণকে কেন্দ্র করে এরকম বহু বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে।

পশুকল্যাণবাদী বা সংরক্ষণবাদী উভয়েই নরকেন্দ্রিকতার বিরোধী, উভয়েই পরিবেশের স্বতঃমূল্য স্বীকার করে থাকেন। তাদের মধ্যে অমিল এই যে, পশুকল্যাণবাদীরা পশুদের স্বতঃমূল্য স্বীকার করেন, সংরক্ষণবাদীরা সমগ্র বাস্তুতন্ত্রের স্বতঃমূল্য মেনে থাকেন। এই মূল্য আরোপের ব্যাপারটিকে কেন্দ্র করেই পরিবেশ নীতিদর্শনে আর একটি বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে। তবে আজকাল কিছু কিছু পরিবেশ নীতিদার্শনিক এরকম বিতর্কেরও বিরোধিতা করেছেন। তাদের মতে পরিবেশ দর্শনের সঙ্গে এরকম মূল্য ভাবনার কোনো সম্পর্ক নেই। এরা বলেন নিবিড় বস্তুতন্ত্রের কথা। নিবিড় বাস্তুদর্শনের মূলকথা এই যে, মানুষ যেদিন প্রকৃতির সঙ্গে নিজেকে অভিন্ন বলে ভাবতে শিখবে সেদিন সে নিজে থেকে পরিবেশের কল্যাণ সাধনে তৎপর হবে। পরিবেশ নীতিদর্শনের তত্ত্বকথার দিনও সেদিন ফুরিয়ে যাবে।

আর একপ্রকার বিতর্ক আছে ব্যক্তিনিরপেক্ষ মূল্যবোধকে কেন্দ্র করে। ব্যক্তি নিরপেক্ষ মূল্যবোধে বিশ্বাসী

নীতিদার্শনিকেরা মনে করেন, পরিবেশের মূল্যায়ন দেশ, কাল, পাত্র ভেদে পৃথক হতে পারে না। এদের মতে পরিবেশের মূল্য ব্যক্তিনিরপেক্ষ। অপর পক্ষে সংরক্ষণবাদীরা মনে করেন, কোনো কিছুকেমূল্যবান বলতে বোঝায় তা কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর কাছে মূল্যবান। ব্যক্তিসাপেক্ষ দৃষ্টির মূল্যবিচার করতে গিয়ে এরা আন্তর্ব্যক্তিক তুলনার ভিত্তিতে পরিবেশের মূল্যায়নে ব্যর্থ হন। ফলে পরিবেশ কর্মনীতি নির্ধারণের বেলায় এরা কোনো আন্তর্ব্যক্তিক হেতু খুঁজে পান না। সার্বিক পরিবেশ নীতি বলে এরা কিছু মানতে পারেন না।

এরকম বিতর্কের আর একটি মাত্রা যোগ করে দিয়েছেন হাল আমলের নারীবাদীরা। নারীবাদীরা নারী ও প্রকৃতির মধ্যে একটা মিল খুঁজে পান — উভয়েই বঞ্চনার শিকার। তাই প্রকৃতির সঙ্গে যুক্ত হওয়া নারীর পক্ষে সহজ, পুরুষের পক্ষে নয়। তাছাড়া নারীর সন্তান ধারণ, সন্তানপালন প্রভৃতি ক্ষমতা জীবনদায়িনী। প্রকৃতির প্রাণদায়িনী ভূমিকাও ঠিক এই গোত্রীয়। আমরা জানি, ১৯৭২-৭৮ খ্রিস্টাব্দে গাড়োয়াল ও কুমায়ুনের পার্বত্য অঞ্চলে মেয়েরা গাছ বাঁচানোর আন্দোলনে নেমেছিল। তা এজাতীয় একাত্মবোধের একটা বড়ো নিদর্শন। জীবন-পণ করে তারা দীর্ঘ সময় ধরে গাছগুলিকে জড়িয়ে ধরে থাকে যাতে বন দপ্তরের কর্মীরা সেগুলি কেটে ফেলতে না পারে। তাতে পরিবারের পুরুষদের সঙ্গে তাদের সংঘাতও বাধে। কিন্তু তাতে এখানকার নারীরা নিরস্ত হয়নি। এমনকি উত্তরপ্রদেশের সরকারের সশস্ত্র বাহিনীও তাদের এই উদ্যমের কাছে হার মানে। নারীবাদীদের মতে মেয়েদের এই ধাত্রীসম ভূমিকা আমাদের পরিবেশ বিষয়ক নীতিবোধে পরিবর্তন ঘটাতে পারে। তার জন্য সামাজিক জীবন বা সামাজিক নীতিসূত্র প্রণয়নে এরকম নারীগুণের সমন্বয় সাধন প্রয়োজন।

পরিবেশ নীতিদর্শনকে কেন্দ্র করে আরও বহু বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে। পরিবেশ চেতনা, সেই সংক্রান্ত নীতিবোধ জাগিয়ে তোলার ক্ষেত্রে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলির অর্থাৎ মঠ, মন্দির, গীর্জা প্রভৃতির কোনো ভূমিকা থাকা উচিত কিনা তাও আজ পরিবেশ নীতিদর্শনের একটি বিতর্ক হয়ে দাঁড়িয়েছে।